ভাস্কর্য ও স্থাপনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শিল্পায়ন

মইনুদ্দীন খালেদ*

পটভূমি

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে স্বাধিকার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে অখণ্ড ভারতে অনেক বিপ্লবী শহিদ হয়েছেন। বিশ শতকের ২০-এর দশকে এ সংগ্রাম হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। পরাজিত হয় ঔপনিবেশিক ইংরেজ। ১৯৪৭-এর দেশভাগে নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে – পাকিস্তান ও ভারত। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এই বিভাজনে হুমকির মুখে পড়ে পাকিস্তানের পূর্ব অংশের মানুষের জীবনাদর্শ। এ আদর্শ বাঙালি এবং আরও অনেক নৃগোষ্ঠীর অসাম্প্রদায়িক জীবনচর্চায় এক পরিস্রুত রূপ লাভ করেছে হাজার বছরের পথ-পরিক্রমায়। তাই ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে এদেশের সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। ফলে অনেক সংগ্রামের পর অনিবার্য হয়ে ওঠে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। বিশ্বের মানচিত্রে বিধৃত হয় নতুন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এ রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে স্বভাবতই ধর্ম নয়, অসাম্প্রদায়িকতা অন্যতম প্রধান গুরুত্ব পায়। শিল্পসৃষ্টির কার্যকারণ সূত্র অন্বেষণের জন্য ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত-পাঠ সংগত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ স্বাদেশিক চেতনা ও স্বাধিকার চেতনা থেকে এই উপমহাদেশে শিল্পচর্চার পালাবদল ঘটেছে এবং জন্ম নিয়েছে নতুন সৃষ্টি। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা আত্মদান করেছিলেন তাদের অবদান কীর্তিত করার জন্যই মূর্তিভাস্কর্যে সমৃদ্ধ ভারতীয় সভ্যতা সেক্যুলার বা অসাম্প্রদায়িক চেতনাজাত ভাস্কর্য নির্মাণ করে এ শিল্পে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ভরকেন্দ্র ছিল কলিকাতা শহর এবং এ আন্দোলনে যে নেতৃবৃন্দ ও বিপ্লবীরা জীবন-পণ সংগ্রাম করেছেন – মৃত্যুবরণ করেছেন – তাদের ত্যাগের মহিমা কীর্তিত করার জন্য কলিকাতা শহরে নির্মিত হয় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্মৃতি-ভাস্কর্য (monumental sculpture)।

ধর্মকেন্দ্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুষ্টনীতির বিরুদ্ধে এ দেশের অসাম্প্রদায়িক জীবন-ভাবনার মানুষের লড়াই ছিল অনিবার্য। যে লড়াই বিশেষ গতি পায় ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে। এ আন্দোলনে যারা মৃত্যুবরণ করেন তাদের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানানোর

---

*অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও শিল্প-সমালোচক

জন্য নির্মিত হয় শহিদ মিনার। এই মিনারই এদেশের মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ জীবনদর্শনের সবচেয়ে গুরুত্ববহ শিল্পসাক্ষী। ভাস্কর নভেরা আহমেদের চিন্তাপ্রসূত এ মিনারের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে সারা বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে ও নগর চত্বরে গড়ে ওঠে মিনার এবং পরিব্যাপ্ত হয় বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির অঙ্গীকার। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন যত বাড়তে থাকে ততই প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সম্মুখ লড়াইয়ে নির্ভয়ে অংশগ্রহণ করে এদেশের মানুষ। অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে সময়। ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচনে এদেশের বিজয়ী নেতার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানি শাসক শুরু করে গণহত্যা এবং শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধেই পরীক্ষিত হয় এদেশের মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ একতাবদ্ধ আদর্শ। কোনো নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা নয় – তার চেয়ে বড়ো দেশ – দেশের মানুষের কল্যাণকামী জীবনবোধ – মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধনের যে জীবনচর্চা ও সাংস্কৃতিক যাপন তা রক্ষা করতে হবে। বহু যুগের বহু মানুষের একতাবদ্ধ পথ-চলার এ সুচেতনার বলেই ৭১-র মুক্তিযুদ্ধে এদেশের মানুষ মুক্ত স্বাধীন দেশ অর্জন করে। ঔপনিবেশিক পর্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা এবং সংগত কারণে এ নগরেই রয়েছে সবচেয়ে বেশি স্মারক-ভাস্কর্য। ৪৭-এর পর এদেশের মানুষ অপরাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যত লড়াই করেছে তার কেন্দ্র ঢাকা শহর। যদিও সারা দেশের মানুষই আন্দোলনে অংশ নিয়েছে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করে আত্মদান করেছে, তবু নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা ও লড়াইয়ের নীতি, কৌশল ও ডাক এসেছে ঢাকা থেকে। ৫২-র ভাষা আন্দোলনের স্মৃতির মিনার ঢাকায় নির্মিত হওয়ার পর তা ছড়িয়ে গেছে দেশের প্রায় সমস্ত শিক্ষাঙ্গনে। দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত চিন্তা ও পরিকল্পনায় ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সংগ্রামী দিক-নির্দেশনা পেয়েছে, তার ভরকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অপরাজেয় বাংলা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুত্থিত করার জন্য নির্মিত হয় স্মারক-ভাস্কর্য 'অপরাজেয় বাংলা'। ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদের (১৯৪৫-২০১৭) গভীর চিন্তাপ্রসূত উচ্চ শিল্পমান-সম্পন্ন এই সৃষ্টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে স্থাপিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) উদ্যোগে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে এর কার্যক্রম কিছুকাল বন্ধ থাকে। ১৯৭৭ সালে পুনরায় শুরু হয় এর নির্মাণ কাজ এবং সমাপ্ত হয় ১৯৭৯ সালে। 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যের সূচনা-কথা জানা যায় ১৯৭২-র নির্বাচিত ডাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক ম. হামিদের ভাষ্যে :

> দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বড় বিজয়ের আনন্দ, মহান অর্জনের পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ সময়ে একটি সুপ্ত হতাশা বিরাজ করছিল। ডাকসুর নেতৃবৃন্দের মাঝে চিন্তার উদ্রেক হয়, কিছু করতে হবে যাতে এদের মাঝে যে হতাশা বিরাজ করছে তা কেটে যায়। আমরা চেয়েছিলাম শোক নয়, শৌর্য।[১]

ডাকসুর নেতৃবন্দের আমন্ত্রণে ভাস্কর আবদুল্লাহ খালিদ 'অপরাজেয় বাংলা' নির্মাণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের আগে ৬৯-এর গণ-আন্দোলনকে ভিত্তি করে এ ভাস্কর 'আমাকে বলতে দাও' নামে মাটি দিয়ে একটি ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন। এই মাটির ভাস্কর্য রূপান্তরিত হয়ে জন্ম নেয় 'অপরাজেয় বাংলা'। এতে রয়েছে তিনটি মানব-অবয়বের সংঘবদ্ধ উপস্থিতি। এটি নির্মিত হয়েছে কংক্রিটের ঢালাই পদ্ধতিতে। নাসিমুল খবির এর নির্মাণরীতি বিষয়ে বলেন :

> স্মারক এই ভাস্কর্যের নির্মাণে সমকালীন পূর্ব ইউরোপীয় সমাজবাদী ভাস্কর্যের অনুপ্রেরণা স্পষ্টত লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, নির্মাণের পর থেকেই এই ভাস্কর্যটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ক্রমাগতভাবে জাতীয় ঐক্য ও প্রণোদনার প্রতীকে পরিণত হয়।[২]

'অপরাজেয় বাংলা'র নির্মাণশৈলী বিষয়ে আলোকপাত করার আগে এর বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। এতে তিনটি মানব-অবয়ব রয়েছে। এদের দুজন পুরুষ ও অন্যজন নারী। মধ্যখানে অবস্থান নিয়েছে কৃষক। কৃষকের কাঁধে রাইফেল, হাতে গ্রেনেড। কৃষকের ডানদিকে 'ফার্স্ট এইড' ব্যাগ হাতে সেবিকা রূপে উপস্থিত নারী আর বাঁ দিকে রাইফেল হাতে ছাত্র। এই তিনটি ফিগারের সম্মিলনে কাজ করে গভীর ভাবনা; এতে ভাস্কর্যমণ্ডিত করা হয়েছে এদেশের নানা শ্রেণির মানুষের একতাবদ্ধতা। যদিও নারী এখানে সেবিকারূপে উপস্থাপিত, তবু সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া সব নারীর প্রতিনিধিত্বের বার্তা দিচ্ছে। ছাত্র এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার্জন করা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। আর কৃষক শুধু কৃষকের নয়, সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী আদর্শকে জানান দিচ্ছে।

'অপরাজেয় বাংলা' মুক্তিযুদ্ধের সংঘবদ্ধ শক্তির এক শৈল্পিক ত্রিকোণোমিতি। ত্রিভুজ আকৃতির ত্রিকোণ বেদীর ওপর তিনজন যোদ্ধার দণ্ডায়মানতার মধ্যেও রয়েছে ত্রিকোণ জ্যামিতির স্পষ্ট হিসাব। কৃষক সবচেয়ে বেশি আগুয়ান, ফলে বাকি দুটি ফিগারের সঙ্গে সংযোগ রেখা টেনে দৃষ্টিপাত করলে ত্রিভুজের ফর্ম উপলব্ধি করা যায়। ফ্রি-স্ট্যান্ডিং বা মুক্ত স্পেসে দণ্ডায়মান ভাস্কর্য অবলোকনের সময় দর্শক তা বিভিন্ন দূরত্ব থেকে নানা কৌণিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে বুঝতে চায়। অপরাজেয় বাংলা দেখতে গিয়ে দর্শক অনুভব করে একটি ত্রিভুজ তাকে ঘোরাচ্ছে। একই সঙ্গে দর্শক অনুধাবন করে যোদ্ধার একতাবদ্ধতার শক্তি এবং প্রতিটি ফিগারের দৈহিক ভঙ্গি। তিনটি ফিগারই উদ্দীপনায় উন্নতশির এবং ধাবমান।

'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে এদেশের মানুষের অংশগ্রহণের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। এতে সর্বাগ্রণী ফিগার কৃষকের। আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে কৃষকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইতিহাস ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে তাৎপর্যবহ বিষয়। এদেশটা কৃষি-প্রধান। কৃষক এখানে প্রধান চরিত্র। স্বভূমি শত্রুমুক্ত করার জন্য কৃষকের সাহসী

উত্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে ভাস্কর আবদুল্লাহ খালিদের ইতিহাস-ভাবনা ও শিল্পাদর্শ একীভূত হয়েছে। শাড়ি পরিহিত নারী, মালকোচা দেয়া লুঙ্গিপরা কৃষক এবং প্যান্ট পরিহিত ছাত্র; – এ তিনটি ফিগারের অবয়ব ও অঙ্গভঙ্গিতেও প্রমাণ মেলে এদেশের মানুষের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। সিমেন্টের ঢালাইয়ে ও ব্লকগুলো জোড়া দেয়ার ফলে যে রেখাভাস ফুটে উঠেছে তাতে দেহজ রূপ বিশেষ প্রাণময়তা পেয়েছে। 'অপরাজেয় বাংলা'কে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারী ভাস্কর্য হিসেবে বিবেচনা করা চলে না। কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশে বিপ্লবী চেতনাপুষ্ট ভাস্কর্যে আমরা দেখি অপরাজিত বেগের প্রকাশে জ্যামিতিক হিসাবের আধিপত্য। অপরপক্ষে অপরাজেয় বাংলায় মানুষী দেহের পৃথুল কাঠামোতে সংবেদ আছে আস্থার; এবং সংঘবদ্ধ অগ্রসরমানতায় আছে মানুষী অভিব্যক্তির প্রকাশ, তা কোনো জ্যামতির আধিপত্যে বিলুপ্ত হয়ে পড়েনি। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ করেছিল এদেশের সর্বস্তরের মানুষ। তাই 'অপরাজেয় বাংলা'য় মানুষী দেহের বৈশিষ্ট্য ও পরিধেয় বস্ত্র জানান দেয় এই সত্য যে, যুদ্ধটা করেছে বাংলাদেশের মানুষ।

স্মৃতি চিরন্তন

১৯৭১-এর ২৫ মার্চের রাতে পাক-হানাদার বাহিনী ভারী অস্ত্র-শস্ত্রে আক্রমণ করে মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনার সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ ঘটনায় ঠিক কতজন নিহত হয়েছিলেন তার সংখ্যা এখনও নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের অনেক সদস্য ২৫ মার্চের রাতে এবং পরবর্তী সময়ে পাক-হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের বর্বর হিংস্রতায় মৃত্যুবরণ করেন। এ হত্যাকাণ্ড স্মরণীয় করার লক্ষ্যে উপাচার্যের বাসভবনের পশ্চিমে অবস্থিত সড়ক-দ্বীপে নির্মিত হয়েছে 'স্মৃতি চিরন্তন' নামক একটি স্থাপনা। এর নাম ফলকে লেখা আছে :

> "স্মৃতি চিরন্তন"
>
> বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যদের নামফলক সমাহার স্থাপিত : ২৬ মার্চ ১৯৯৫, সংস্কারকৃত : ৩০ এপ্রিল ২০১৫।

তথ্যপূর্ণ উল্লিখিত ফলক আলাদাভাবে ইংরেজি ভাষাতেও সংযুক্ত করা হয়েছে।

ইতিহাস-পাঠ, শোকগাথা ও শ্রদ্ধা-নিবেদন; – এই তিন সূত্রে 'স্মৃতি চিরন্তন' স্থাপনার মর্ম অনুভূত হয়। এই স্মারক-স্থাপনায় যুগপৎ কাজ করেছেন চিত্রশিল্পী, মৃৎশিল্পী ও স্থপতি। তবে এর মূল রূপকার দেশের স্বনামধন্য মৃৎশিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার (১৯৫৪-২০০৫)। এ-কাজ তাঁরই চিন্তাপ্রসূত এবং পরিকল্পনাও তাঁরই। আবু সাঈদ তালুকদার ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষক। তিনিই টেরাকোটা

ফলক দেয়ালে গেঁথে এদেশের মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ অবধি উপস্থাপন করেন। তবে এই ফলকে বিধৃত ঘটনার খসড়া বা লে-আউট করেন শিল্পী রফিকুন নবী। আদি ভাবনা অক্ষুণ্ন রেখে ২০১৫ সালে টেরাকোটা ফলকগুলো পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং এ-কাজ সম্পন্ন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী। এ স্থাপনাকে আরও তাৎপর্যবহ ও দর্শকঘনিষ্ঠ করে তোলার লক্ষ্যে এ সময় স্থপতি মশিহউদ্দিন শাকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি উপস্থাপনায় নতুন যে ভাবনা ও পরিমার্জনা করেছিলেন সে-বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান নিবন্ধকারকে জানান:

> তারিখ বা সন ঠিক মনে নেই। তখন আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকী উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন। আমিও স্থপতি আবদুল মোহাইমেন এ স্থাপনার বিন্যাস নিয়ে নতুন করে ভাবি। ... আগে শহিদদের নামগুলো যেভাবে দেয়ালে লেখা ছিল তাতে সেগুলো অনেকটা সাইনবোর্ডের মত মনে হতো। আমরা চেয়েছিলাম কেউ এটা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখবে না – এর ভেতর প্রবেশ করুক। এজন্য দুদিকে দুটি অ্যাপ্রোচের কথা চিন্তা করলাম। এই অ্যাপ্রোচ (প্রবেশ পথ) দিয়ে মানুষ এখানে আসবে।[৩]

মশিহউদ্দিন শাকের 'স্মৃতি চিরন্তন' স্থাপনায় যুক্ত করেছেন একটি ফোয়ারা। গোলাকার ফোয়ারার ভেতরের জল লাল আর চারপাশে বর্ডার হবে সবুজ রঙের। ফলে তা রূপ নেবে বাংলাদেশের পতাকার। ফোয়ারা হলেও তা আর কার্যকর করা হয়নি। এসব কথা স্থপতি উল্লিখিত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন।

'স্মৃতি চিরন্তন'-এ রয়েছে নানা ভাবনার মাত্রায়ণ। এ বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণের আগে স্থাপনার অনুষঙ্গগুলোর বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা প্রাসঙ্গিক। এতে আছে কংক্রিটের মেঝে, দেয়াল, সিঁড়ি, র‍্যাম্প (ঢালু প্রবেশ পথ), গ্রানাইট পাথর, টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলক, পাথরের বেদি, বৃত্তাকার ঝর্নার কাঠামো এবং প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ সবুজ ঘাস ও ফোয়ারা জল। এ স্থাপনা বিষয়ে গবেষক আয়শা বেগম বলেন:

> দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯৯৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে এর নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। স্মৃতি ফলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন শিক্ষক, ১ জন ডাক্তার (কর্মকর্তা), ১০৫ জন ছাত্র, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী – সব মিলিয়ে ১৯৪ জন শহিদের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মোট ১৪টি দণ্ডায়মান প্রাচীরের গাত্রে স্থাপিত হয়েছে পোড়ামাটির ফলক, যার মধ্যে ৬টি আকারে ছোটো এবং আটটি অপেক্ষাকৃত বড়ো। সবগুলো দণ্ডায়মান প্রাচীর একই উচ্চতাবিশিষ্ট; কম প্রশস্ত প্রাচীরের উভয়দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীর নাম-পরিচয় এবং অবশিষ্টগুলোর বহির্গাত্রে একদিকে টেরাকোটা নকশাফলক স্থাপিত হয়েছে।[৪]

বিষয়-ভাবনা, উপস্থাপন-রীতি ও নান্দনিক ভাবনার নিরিখে 'স্মৃতি চিরন্তন' অনন্যতার দাবি রাখে। এ স্থাপনায় দুটি প্রবেশ-পথ রয়েছে। পূর্বদিকে একটি র‍্যাম্প বা ঢালু পথ। এই পথ দিয়ে হুইল চেয়ারে চলাচলকারী মানুষ এবং বিশেষ করে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা এখানে আসতে পারবেন। অন্য প্রবেশ পথে আছে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে স্থাপনা চত্বরে প্রবেশ ঘটবে সর্বস্তরের মানুষের। উত্তরমুখী এই প্রবেশ পথই স্থাপনার সম্মুখ অংশ। সিঁড়ি থেকে কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে তাকালে চোখে পড়বে অনতিউচ্চ দেয়াল, দেয়ালের গায়ে খোদিত কালো পাথরে সাদা অক্ষরের সিঁড়ি, পোড়ামাটির ফলক, সিঁড়ি অতিক্রমের পরই একটি কালো পাথরের বেদি, মেঝেয় কালো ও ধূসর-সাদা কংক্রিটের বর্গাকার স্ল্যাব এবং কয়েকটি চৌকোণ স্পেস স্ল্যাবে ঢাকা নয় বলে সেখানে সবুজ ঘাসের জ্যামিতি-উত্তীর্ণ প্রকাশ। সার্বিক উপস্থাপনায় একটা সৌম্য ভাব আছে। কোনো অনুষঙ্গই উচ্চকিত নয়, অলংকারবহুল নয়। আড়াআড়িভাবে স্থাপিত, কিন্তু একটির সঙ্গে আরেকটি লাগানো নয়, মাঝখানে ফাঁক রয়েছে, ফলে দেয়ালগুলোতে স্তম্ভের ইশারা আছে। দেয়ালগুলো গৃহের চারদেয়ালের আবদ্ধতা সৃষ্টি করে না; বরং তার ভেতরে প্রবেশ করে একটি স্পেস থেকে আরেকটি স্পেসে প্রবেশের আহ্বান জানায়।

অদূরে দাঁড়িয়ে 'স্মৃতি চিরন্তন' স্থাপনায় দৃষ্টিপাত মাত্রই স্তম্ভমান দেয়ালের আকারের আগেই দর্শকের চোখ পাঠ করে মেটুলি রংয়ের মৃৎফলক, কালো গ্রানাইট, সাদা ও ধূসর রংয়ের কংক্রিটের স্ল্যাব আর ঘাসের সবুজ। পোড়ামাটির লাল রং বাংলার সভ্যতার সূত্র নির্দেশ করে। নদীমাতৃক এদেশে এটেল মাটি অঢেল পাওয়া যায় বলে এদেশের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন নির্মিত হয়েছে লাল ইটে। তাছাড়া মৃৎফলকে খচিত অনেক বিখ্যাত মসজিদ ও মন্দির রয়েছে এদেশে। তাই এ রংয়ের সঙ্গে এদেশের মানুষের সম্পর্কটা প্রত্নগন্ধী মনস্তাত্ত্বিক। ধূসরের বিপরীতে কালো রং মনকে শোকাভিভূত করে। কিন্তু সবুজ ঘাস শোকের বিপরীতে প্রকাশ করে জীবনের অমরত্ব – সজীব বিকাশ। শহিদের কথা স্মরণ করে সন্তপ্ত হওয়া এবং তাদের আত্মদানের মহিমাকে অনুভব করে স্বদেশের গৌরাবান্বিত ইতিহাসপাঠ— এই দুই বোধে জারিত হয় দর্শকের মন।

কীভাবে দর্শক 'স্মৃতি চিরন্তন'-এ প্রবেশ করবেন তার একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য আনুষ্ঠানিকতা আছে। প্রবেশের শুরুতেই রয়েছে মুহ্যমান বেদনার স্মারক কালো পাথরের বেদি। এ বেদিতে দর্শক শহিদের উদ্দেশে পুষ্পার্ঘ দেবেন। তারপর বাঁদিকের পোড়ামাটির ফলকে পাঠ করবেন কবির এপিটাফপ্রতিম কবিতা :

মরণসাগর পারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়ে গেলে আপনারি ঘর
তোমাদের স্মরি ॥ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ বাণী পাঠের পরই দেয়ালের অপর পিঠে গিয়ে দর্শক দেখবেন ধূসর দেয়ালে একটি চৌকোণ কালো পাথর-ফলক লাগানো রয়েছে। এতে কিছু লেখা নেই, কোনো ছবি নেই। কালোতে নিজেকে সমাহিত করা এবং শহিদের আত্মদানের তাৎপর্য নিরঙ্কুশভাবে অনুভব করে মনকে ধ্যানস্থ করার জন্যই এ আয়োজন। তারপর গ্রন্থপাঠের মতো বাঁ থেকে ডানে, দেয়ালের পর দেয়ালে গ্রানাইটের কালোয় খোদিত সাদা অক্ষরে শহিদদের নাম-পরিচয় পাঠ করে চলে দর্শক। শ্রদ্ধাভরে ধীর পায়ে হেঁটে চলে দর্শক নির্বিঘ্নে। কারণ দেয়ালগুলো এমনভাবে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে যাতে তিনটি দেয়ালের পাঠ শেষ হলে অনায়াসে আবারও তেমনি দেয়ালের স্পেসের দিকে অগ্রসর হয় দর্শক। পাঠে বিরাম দিয়ে আবারও দুঃখ পাঠের এক শৈল্পিক আয়োজন রয়েছে দেয়ালের বিন্যাস কৌশলে। ওই বিরাম তৈরি হয়েছে দেয়ালগুলোর মাঝখানে যে ফাঁক রয়েছে তা দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে বাইরের প্রকৃতি দেখার সুবাদে। শহিদদের নাম পাঠে একাগ্রচিত্ত থাকা এবং পরমুহূর্তে আবার প্রকৃতি দেখে বিরাম নিয়ে আবার চিত্তের একাগ্রতায় ফিরে আসা নাম পাঠের জন্য। এ সৃজনরীতি বস্তুত গ্রন্থ পাঠের সমার্থক। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় মানুষের আত্মদানের ইতিহাসপাঠ। নাম-পরিচয়ে জানা যায় এদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহিদেরা মুসলমান ও হিন্দু – ধর্ম পরিচয়ে এদেশের প্রধান দুই জনগোষ্ঠী। মুসলমান নামধারী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে নিহত মানুষগুলো আসলে এদেশের মানুষ ছিল – তারা বাঙালি – এজন্য তাদের মরতে হয়েছে। তাই মুসলমান নাম পরিচয়েও তারা রক্ষা পায়নি আর মৌলবাদী হিংসায় উন্মত্ত পাকিস্তানি ঐ নরপশুরা হিন্দুকে হত্যা করে পাশাবিক আনন্দ উদ্‌যাপন করেছে। এই স্থাপনার নামগুলো এদেশের মুক্তি সংগ্রামের স্বরূপ বিশ্লেষণের বিশেষ দালিলিক সাক্ষী। এজন্যই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিধৃত করা হলো। কালো পাথরের বুক কেটে সাদা অক্ষরে লেখা নাম পাঠশেষে আবারও দর্শকের চোখ একটি শূন্য কালো বর্গাকার জ্যামিতিতে এসে স্থির হয়। কালো দুঃখের পাথর থেকে আবার কালো দুঃখের পাথরের সমাপ্তিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করানোর এ শৈল্পিক আয়োজন এই সত্যই জানান দেয় যে, এ-ঘটনা কোনো দুর্ঘটনা নয় – এটাই এদেশের মানুষের আত্মদানের ইতিহাস – স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। এজন্য জমাট কালোয় উপস্থাপিত ইতিহাসের বেদনামথিত রূপ। নিরুদ্ধ শোকাভিভূত মানসিক অবস্থা কবির বাণীতে নতুন মাত্রা পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের বাণী পোড়ামাটি ফলকে পাঠ করে এবং তারপর কালো গ্রানাইটে লেখা ইতিহাস পড়ে আবারও আমরা মুখোমুখি হই আরেকটি পোড়ামাটি ফলকের। এখানে আত্মদানের মর্মার্থ জানান দেন কাজী নজরুল ইসলাম :

ঐ শহিদ ভাইদের মনে কর
আর গভীর বেদনায় স্তব্ধ হইয়া যাও।
মনে কর তোমাকে মুক্তি দিতেই সে
এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে।

'স্মৃতি চিরন্তনে'র বহির্দেশের দেয়ালে রয়েছে আয়তাকার আটটি টেরাকোটা ফলক। এই ফলকে উপস্থাপিত বিষয়ে আবহমান বাংলাদেশের রূপ এবং ৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু ৭১-এর যুদ্ধ চিত্রায়িত হয়েছে। আবহমান বাংলাদেশ মানে নদীমাতৃক বাংলাদেশ – অবারিত সমতল– ফসলের মাঠ – শ্যামল প্রকৃতি।

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি।"
"মোদের গরব মোদের আশা
আ-মরি বাঙলা ভাষা।।"

– এসব বাণীলিখিত ব্যানারের পাশাপাশি শহিদ মিনার এবং মিনারের পুষ্পময় পুরোভূমিতে প্ল্যাকার্ডে ভাষা-শহিদদের নাম। যে ফলকগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা চিত্রার্পিত হয়েছে তাতেও সুচিহ্নিত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম। ফিগারের অভিব্যক্তিতে এ দেশীয় মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য। নারী ও পুরুষ একই সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ। সেই সঙ্গে বেদনাদায়ক ঘটনাও রয়েছে। যেভাবে চোখ ও হাত বেঁধে এদেশের মানুষকে শত্রু-সেনারা হত্যা করেছে সেই বাস্তবতা সত্যনিষ্ঠভাবে পোড়ামাটি ফলকে উপস্থাপিত হয়েছে।

'স্মৃতি চিরন্তন'কে স্থাপত্য ও চারুশিল্পের সমন্বয়ে রচিত গ্রন্থপ্রতিম উপস্থাপনা হিসেবে অভিহিত করা চলে। দেয়ালগুলো যেন ইতিহাস বইয়ের পাতা। এর একদিকে ইতিহাস লিখিত আছে অক্ষরে, আর অপর পিঠে রয়েছে ইতিহাসের চিত্রময় রূপায়ণ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এমন বস্তুগত উপাদানের শৈল্পিক নির্মাণে পাঠ করানোর নিদর্শন এদেশের শিল্পের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

'স্বাধীনতা সংগ্রাম' নামে এদেশের প্রধান ভাস্কর্যশিল্পী শামীম সিকদার একটি 'ভাস্কর্য-বাগান' সৃষ্টি করেছেন। উদয়ন বিদ্যালয়, এস.এম. হল, জগন্নাথ হলের মাঝে ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের দক্ষিণ দিকে যে সড়ক-দ্বীপ রয়েছে, সেখানে শিল্পী স্থাপন করেছেন ১০৮টি ভাস্কর্য। এই ভাস্কর্য-বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী বাদুল গোয়ালা এ-নিবন্ধকারকে জানিয়েছেন, এতে শুরুতে ১০৯টি ভাস্কর্য ছিল। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় একটি ভাস্কর্য ভেঙে পড়ায় তা সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এ বাগানের আরও অনেক ভাস্কর্য অযত্নে ও সংস্কার না করায় নষ্ট হতে চলেছে।

'স্বাধীনতা সংগ্রাম' এদেশের মানুষের সংগ্রামী জীবনের আলেখ্য। এত বেশি সংখ্যক ভাস্কর্য নিয়ে আর কোনো ভাস্কর্য-বাগান এদেশে নেই। ১৯৯৯ সালের ৭ই মার্চ এ শিল্প-উদ্যান উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আবক্ষ ভাস্কর্য ও সুউচ্চ মনুমেন্ট

ভাস্কর্যের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই শিল্প-বাগান। 'ভাস্কর্যের শীর্ষে স্থান পেয়েছে সবুজ পতাকার মাঝখানে খচিত লাল সূর্য এবং তার নিচে মুক্তিযুদ্ধের প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবয়বে ফুটে উঠেছে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' ভাস্কর্য ভূমি থেকে ৬০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এবং পরিসীমা ৮৫.৭৫ ফুট। এর ১৩৭ ফুট স্থান জুড়ে সারিবদ্ধভাবে স্থাপন করা হয়েছে আরও অনেকটি ছোট আকৃতির ভাস্কর্যকর্ম। সর্বমোট ১৫০০ বর্গফুট সড়ক দ্বীপের জায়গা জুড়ে এ ভাস্কর্য শিল্পকর্মটি পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করেছে।[৫]

এ উদ্যানে আলোর প্রক্ষেপণে, ঝরনার জলের শব্দে এবং প্রযুক্তিগত আয়োজনে দেশাত্মবোধক গান বাজানোর ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে প্রাণময় করে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও বর্তমানে এ ব্যবস্থা আর সচল নেই। তবে শুধু ভাস্কর্য পাঠ করেও এদেশের মানুষের কর্মকৃতির ইতিহাস পাঠ করা যায়। একান্তভাবে আন্দোলন-সংগ্রামের নেতৃবর্গ নয়, জ্ঞানপথের আরও অনেক মানুষের আবক্ষ ভাস্কর্য স্থাপিত হয়েছে এ আয়োজনে। লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত – এমনই অনেক কবি, সাহিত্যিক ও সাধকজনকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে শামীম সিকদার বাঙালির জ্ঞানচর্চার দীর্ঘ ইতিহাস বিষয়ে দর্শককে সজাগ রাখতে চেয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসীমায় অবস্থিত বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য স্যার পি. জে. হারটগের ভাস্কর্য রয়েছে উদ্যানের পশ্চিম দিকের প্রবেশ পথে। এদেশের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য, সহযোগিতা ও প্রেরণা দিয়েছেন অন্য দেশের অনেক মহান মানুষ। তাই এ শিল্প উদ্যানে ভাস্কর্যরূপ পেয়েছেন সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন।

শামীম সিকদার ভাস্কর্য নির্মাণে দুটি রীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি ইতালীয় রেনেসাঁস্নাত ভাস্করদের হাতে নির্মিত ন্যাচারালিস্টিক ভাস্কর্য অনুসরণ করেছেন। যদিও ইংরেজ আমলের ভিক্টোরীয় রীতির মিশ্রণে তার বেশির ভাগই আশানুরূপ প্রাণময় হয়নি। তা হয়ে পড়েছে কেবলই নিয়মনিষ্ঠ মাপ-জোক– রীতি-দুরস্ত। অপর যে পদ্ধতির ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে তা সিমেন্ট কাস্টিং প্রক্রিয়ায়। এক্সপোজড সিমেন্টে কংক্রিটের উপাদানগত বৈশিষ্ট্য এতে পাঠ করা যায়; ধূসর দানাদার বহিরঙ্গে ছন্দোময় প্রাণাবেগ অনুভূত হয়। যতদূর জানা যায়, এ রীতিতে সর্বোচ্চ পারমিতা প্রমাণ করেছেন রামকিঙ্কর বেইজ। অভিব্যক্তিহীন ভিক্টোরীয় রীতিনিষ্ঠ শামীম সিকদারের আবক্ষ ভাস্কর্যগুলো শিল্পমানে উত্তীর্ণ নয় – এর বেশিরভাগই মূর্তিবৎ স্থাণু। আর সিমেন্ট কাস্টিং রীতি অবলম্বন করে তিনি যে ভাস্কর্যগুচ্ছ নির্মাণ করেছেন তাতেও রয়েছে কংক্রিটের দানায় প্রকাশের আতিশয্য।

তবে শামীম সিকদার এদেশের মানুষের বিচিত্র জ্ঞানসাধনার ও সংগ্রামের ইতিহাসের যে পাথুরে প্রামাণিকতার মানচিত্র রচনা করেছেন তা বিশেষ মূল্যায়ন দাবি করে।

এদেশের ইতিহাস প্রমূর্ত হয়েছে শিল্পে। বস্তুগত উপাদানের চাক্ষুষ দৃষ্টান্তের এই ন্যারেটিভ পাঠে আমজনতার মনে এদেশের ইতিহাস গাঢ়তরভাবে অনুভূত হবে। কারণ, শিল্পের, বিশেষ করে ভাস্কর্য শিল্পের সঙ্গে জনতার সংযোগ অন্য শিল্পমাধ্যমের চেয়ে ঘনিষ্ঠ। এ ভাস্কর্যের বয়ানে রয়েছে ইতিহাসের শুদ্ধতম পাঠ। তাই সব ভাস্কর্য ছাপিয়ে তিনি উত্তোলিত করে নির্মাণ করেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মনুমেন্টাল আকার-আয়তনের ভাস্কর্য। এ ভাস্কর্যে রয়েছে অপরাজেয় অভিব্যক্তির দ্যোতনা। শুধু পাকিস্তানের নিপীড়ক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নয়, একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বুদ্ধিদীপ্ত লড়াই করে শেখ মুজিবুর রহমান জন্ম দিয়েছেন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। পৃথিবীর মানচিত্রে ইতঃপূর্বে বাংলাদেশ নামে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না। মুজিব-ব্যক্তিত্বের মর্ম অনুধাবন করেই শামীম সিকদার আকাশচুম্বি উচ্চতায় তাকে অধিষ্ঠিত রেখেছেন। বক্তৃতারত মুজিবের প্রত্যয়ী তর্জনী আর উপরে উড্ডীন লাল-সবুজ পতাকা নিরন্তর জানান দিচ্ছে এই সত্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ রাষ্ট্রের জনক।

শিল্পমানে আশানুরূপ সমৃদ্ধ না হলেও 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' ভাস্কর্য-বাগান জনতাকে ইতিহাস পাঠে উদ্বুদ্ধ করে। এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এখানে এদেশের সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস শিল্পের অবলম্বনেই বিশাল ব্যাপ্তিতে পাঠ করা সম্ভব।

জয় বাংলা

৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ যে শিল্পীদের সৃজন-চেতনায় তুমুল আলোড়ন এনেছে তাদের মধ্যে ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে তাঁর মতো অধিক সংখ্যক ভাস্কর্য অন্য কোনো ভাস্কর্য-শিল্পীর হাতে নির্মিত হয়নি। শুধু সংখ্যায় নয়, শৈল্পিক উপস্থাপন ও নতুন মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও হামিদ সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর সৃজন ভাবনার অভিঘাতে ইতালীয় রেনেসাঁ-প্রসূত একাডেমি রীতির ন্যাচারালিস্ট ভাস্কর্য চর্চার যে ক্ষীণ ধারা এদেশে ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মুক্তাঙ্গনে স্থাপিত যে-ভাস্কর্য দর্শক নানা দূরত্বে ও নানা কৌণিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে শিল্পস্বাদ উপভোগ করতেন, সে-ভাবনায় আর সীমায়িত রইল না এ ভাস্করের শিল্পকর্ম। এর কারণ যুদ্ধের ভয়াল অভিজ্ঞতা। ভাস্কর্য চর্চার প্রধান বিষয় মানুষ। মুক্তাঙ্গনে দণ্ডায়মান ভাস্কর্য অবলোকিত হয় মাটি স্পর্শ করে দৃষ্টির আকাশে উড্ডয়নে। কিন্তু বধ্যভূমিতে ও গণকবরে মানুষী দেহ আমরা দেখেছি বিপ্রতীপ দৃষ্টিপাতে। হামিদ সে ভূগর্ভে শায়িত মানুষের বিখণ্ড হাড়কে বিষয় করে ভাস্কর্য রচনা করেছেন। সেই ভাস্কর্য দেখতে হলে আনত দেহে দৃষ্টিকে ভূমিতেই বিচরণশীল রাখতে হয়। শোকার্ত আবেগের ভাস্কর্য রূপায়ণে সীমায়িত না থেকে ৮০-র দশকে শক্তি ও সাহসের বোধে উজ্জীবিত হন হামিদ। জাহাঙ্গীরনগরে স্থাপিত তাঁর সংশপ্তক ভাস্কর্যে যুদ্ধাহত যোদ্ধার তির্যক ভঙ্গিতে আছে বিজয়ের স্বপ্ন।

মাটি, কংক্রিট, পাথর, পিতল ও নানা ধাতব উপাদানে ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন হামিদুজ্জামান খান। মাধ্যমের গুরুত্ব অনুধাবন সব সৃষ্টিরই গোড়ার কথা। উপাদানের সঙ্গে কথোপকথন না করে তাকে নমিত করা যায় না; তার দেহ ছুঁয়ে-ছেনে আশানুরূপ অভিব্যক্তি আবিষ্কার করা চলে না। হামিদ মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান ছাত্রাবাসের প্রাঙ্গণে একটি ভাস্কর্য গড়েছেন। 'জয় বাংলা' নামাঙ্কিত এ ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে নিখাদ ইস্পাতে। ইস্পাত অনম্য। তাই এ পাতগুলো সামান্য বাঁকিয়ে বেয়োনেট-শীর্ষ রাইফেল-উঁচানো হাতের মুক্তিযোদ্ধাকে ভাস্কর্যমণ্ডিত করেছেন হামিদ। এছাড়া বুকে পেঁচানো বেল্টে কার্তুজ, কোমরের বেল্টের খোপে গ্রেনেড এবং আত্মরক্ষা ও শত্রুকে আঘাত করার সরঞ্জামের জন্য রয়েছে আরও তিনটি পকেট। অভিযানের অগ্রযাত্রায় এবং বিজয়ের উল্লাসে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে যেভাবে ক্ষিপ্র ও প্রলম্বিত হতো মুক্তিযোদ্ধার দেহ তারই স্মারক এই নয় ফুট উচ্চতার ভাস্কর্য।

ইস্পাত যুগপৎ সুচিক্কন ও দার্ঢ্য গুণসম্পন্ন। যোদ্ধার মহীয়ান প্রকাশে এ শঙ্কর ধাতু বিশেষ ভূমিকা রাখবে – এই বিশ্বাস থেকেই হামিদ বহুকৌণিক ফর্মের সংযোজনে এ-ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন। ইস্পাতের অনম্য স্বভাব যোদ্ধার দুর্মর তেজ ও অপরাজেয় মনোভঙ্গির ইঙ্গিত বহন করে। উজ্জ্বল দর্পণের মতো ইস্পাতের পাত থেকে বিকীর্ণ হয় আলো। সূর্যের আলোয়, চাঁদের আলোয় ইস্পাতে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকে যোদ্ধার অঙ্গীকার, এবং তা থেকে উৎসারিত আলোর রশ্মিতে ভাষা পায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

'জয় বাংলা' ভাস্কর্যে ইস্পাতের কাঠিন্য ও ঔজ্জ্বল্য উপজীব্য করে যে শৈল্পিক কৃৎকৌশল প্রদর্শন করেছেন হামিদুজ্জামান তা এদেশের ভাস্কর্যচর্চার ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

তথ্য-উৎস

১ ম. হামিদ, 'পাওয়ার টক শো', 'এটিএন বাংলা', ২২ মে ২০১৭

২ নাসিমুল খবির, 'প্রসঙ্গ : বাংলাদেশের সমকালীন ভাস্কর্য', শিল্প ও শিল্পী, ১ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ২০১২, পৃ. ৩২

৩ মশিহউদ্দিন শাকেরের সঙ্গে এ নিবন্ধকারের সাক্ষাৎকার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ (সাক্ষাৎকারটি প্রবন্ধের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে)*

৪ আয়েশা বেগম, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে-ওঠা মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নির্দশন : পর্যালোচনা'; 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ নিবন্ধমালা', ২০১৯, সম্পাদনা : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৯৩

৫ আয়েশা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

***স্থপতি মশিহউদ্দিন শাকেরের সঙ্গে নিবন্ধকারের সাক্ষাৎকার**

মইনুদ্দীন খালেদ : আপনি কখন, কীভাবে স্মৃতি চিরন্তন কাজের সঙ্গে যুক্ত হলেন?

মশিহউদ্দিন শাকের : তারিখ বা সন আমার ঠিক মনে নেই। তখন আরেফিন সিদ্দিক উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন। কাজটা মূলত চারুকলার শিক্ষক আবু সাঈদ তালুকদারের। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন এ কাজের পরিকল্পনা করা হয় তখন স্থপতি মযহারুল ইসলামও পরামর্শক হিসেবে ছিলেন। আমি ও স্থপতি আবদুল মোহাইমেন এ স্থাপনার বিন্যাস নিয়ে নতুন করে ভাবি।

ম. খা. : নতুন ভাবনাটা কী?

ম. শা. : আগে শহিদের নামগুলো যেভাবে দেয়ালে লেখা ছিল তাতে সেগুলো অনেকটা সাইনবোর্ডের মত মনে হতো। আমরা চেয়েছিলাম বিষয়টি কেউ দূরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখবে না – এর ভেতরে প্রবেশ করুক। এ জন্য দুদিকে দুটি অ্যাপ্রোচের কথা চিন্তা করলাম। এই অ্যাপ্রোচ (প্রবেশ পথ) দিয়ে মানুষ এখানে আসবে।

ম. খা. : আপনাদের আর কী পরিকল্পনা যুক্ত হয়েছে?

ম. শা. : আমি চেয়েছিলাম সড়কদ্বীপের অনুচ্চ ভাবটার সঙ্গে যেন মূল কাঠামোর সঙ্গতি থাকে। হঠাৎ সৌধের মতো কিছু উঠে গেলে তাতে দর্শকের সম্পর্ক বিঘ্নিত হবে।

ম. খা. : এ ছাড়া আর কোনো পরিকল্পনা যুক্ত করার বিষয়ে ভেবেছিলেন কি?

ম. শা. : হ্যাঁ। পশ্চিম দিকে আমরা একটা ফোয়ারার নকশা যুক্ত করেছিলাম। কাজটা সম্পন্ন হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম ফোয়ারার মাঝখানের বৃত্তের জলের রং হবে লাল এবং চারপাশে থাকবে সবুজ অর্থাৎ আমাদের পতাকা। ফোয়ারাটা নির্মিত হলেও তা আর চালু করা হয়নি।

ম. খা. : আপনাকে ধন্যবাদ।

ম. শা. : আপনাকেও ধন্যবাদ।